

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল; সূরা মায়দার ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা। এ সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে মৌলিক কিছু আলোচনা করবো, বি-ইযনিল্লাহ। এ বিষয়টি বুঝার জন্য সম্পূর্ণ আলোচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:-

১. উক্ত আয়াতগুলোর প্রচলিত তাফসীরের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এবং কুরআনের সাথে সেগুলোর কতটুকু সামঞ্জস্যতা রয়েছে?

২. এই আয়াতগুলো বর্তমান শাসকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার সুযোগ আছে কিনা?

৩. এই আয়াতগুলোকে সম্পর্কে মুফাসসিরগণের যেই তাফসীর রয়েছে সেগুলো কোন অবস্থা ও কোন শ্রেণীর লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

৪. এই আয়াতগুলো সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর যেই ব্যাখ্যা রয়েছে সেই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ও প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল?

৫. আলোচনা বোঝার এবং অস্পষ্টতা দূর করার জন্য সম্পূর্ণ কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা মায়েদার এই তিনটি আয়াতের প্রচলিত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্যতা
কতটুকু???

সূরা মায়েদার ৪৪, ৪৫, ৪৬ নং আয়াতকে সামনে রেখে ঢালাও ভাবে যেই
ব্যাখ্যা করা হয় তা হলো এই যে- "আকীদা বিশ্বাস ঠিক থাকলে ফাসেক হবে,
কাফের হবে না। আর যদি আকীদা বিশ্বাস ঠিক না থাকে তাহলে সে কাফের
হবে।

এ ধরনের ব্যাখ্যার অন্যতম কারণ হলো; আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর
ভিন্নতা। তবে এছাড়াও আরো কয়েকটি মর্মান্তিক কারণ রয়েছে, যেগুলো না
বলেই নয়! তা হলো, দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলা। কুরআনের ব্যাপারে
অজ্ঞতা। ইসলামের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ। নিজেদের বুঝ-
বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে সমাধান বের করার উন্মাদনা। এক স্থানের আলোচনা
অপর স্থানে প্রয়োগ করা। সমাজে ব্যবহৃত নিজেদের পরিভাষাগুলো দিয়ে
কুরআন, হাদীস ও ইসলামের পরিভাষাগুলো বর্ণনা করা ইত্যাদি।

যাই হোক লক্ষণীয় বিষয় হল; আয়াতে কারিমায় ব্যবহৃত এই শব্দের ভিন্নতার
কারণে এ ধরনের ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে কিনা? শরীয়তের মানদণ্ডে
এর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? অবশ্যই এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে।
উল্লেখিত আয়াতগুলোতে ব্যবহৃত শব্দের পার্থক্যের কারণে এরকম শর্ত
যুক্ত করে মূল বিষয়টি ব্যাখ্যা করার কোন অর্থই হয় না। এর কোন ভিত্তি
নেই, বরং সুযোগই নেই। এই বিষয়টি বুঝার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে
কুরআনের পরিভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আর এটা স্বতসিদ্ধ
বিষয় যে, পরিভাষা কখনো নিজেদের মন মতো গ্রহণ করার সুযোগ নেই।
প্রত্যেকটি পরিভাষা তার আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। এবং পরিভাষার
উৎসের উপর নির্ভর করেই তার সাথে সম্পৃক্ত সকল কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করা হবে। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ কিংবা স্থান-কালের ভিত্তিতে
নিজেদের মতো করে কোন পরিভাষা নির্ধারণ করা বা প্রয়োগ করার

সামান্যতম সুযোগও নেই। তাই কুরআনের পরিভাষাগুলোকে কুরআনের আঙ্গিকেই আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং সেই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

কুরআনের পরিভাষা-

কাফের জালেম ও ফাসেক। এই প্রতিটি শব্দের অর্থ এক অভিন্ন। এগুলো একটি অপরটির সমর্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার হয়। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে- সূরা মায়েরদার ৪৪ নং আয়াতে উল্লেখিত কাফের শব্দটা বলা হয়েছে "মুসলিমদের" জন্য। ৪৫ নং আয়াতে উল্লেখিত জালেম শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে ইয়াহুদীদের জন্য। আর ৪৬ নং আয়াতে উল্লেখিত ফাসেক শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে "নাসারা" (খৃষ্টানদের) জন্য। এখন আমরাই বলি ইয়াহুদি ও খৃষ্টানরা কি মুমিন না কাফের? নিঃসন্দেহে তারা কাফের। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাদের ব্যাপারে ফায়সালা (ফতোয়া) দিতে গিয়ে "জালেম" ও "ফাসেক" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় "জালেম ও ফাসেক" দ্বারা প্রকৃত কাফের অর্থাৎ মুসলিমের বিপরীত কাফের বুঝানো হয়। সুতরাং এই আয়াতগুলোকে নির্দিষ্ট কোন এক জাতি গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত করা, তারপর তাদের কর্মের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরে, সেই ভিত্তিতে হুকুম বর্ণনা করার কোন সুযোগই নেই। এখন আমরা দেখি আয়াতে আলোচিত জাতিগুলোর অবাধ্যতার ধরণ কেমন ছিল? অর্থাৎ তারা কি নিজেদের আকীদাবিশ্বাস পরিবর্তন করে আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফায়সালা (সিদ্ধান্ত) দিয়েছিল, নাকি শুধু তাদের কর্মের মধ্যেই পরিবর্তন এসেছে, বিশ্বাসের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি? তাদের অবস্থা কেমন ছিল? নিঃসন্দেহে বলা যায় তাদের পরিবর্তনটা শুধু কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আকীদা বিশ্বাসের কোন যোগসূত্র সেখানে ছিল না। এই বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। কারণ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দেয়ার ক্ষেত্রে আকীদা-বিশ্বাসের কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। বরং সরাসরি তাদের

কর্মের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাছাড়া যার সামান্যতম জ্ঞান বুদ্ধি রয়েছে এবং ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আছে, সে ভালো করেই বুঝতে পারে যে- যদি কারো আকীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তার গোমরাহ তথা পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকই যথেষ্ট। কর্মের মাধ্যমে সেই আকীদা-বিশ্বাসের বাস্তবায়ন করা জরুরী না। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেয়াকে সঠিক মনে করে, তাহলে তো তার "কাফের" হওয়ার জন্য এতটুকই যথেষ্ট। বিচারপতির পদ গ্রহণ করে কিংবা। বিচার সালিশে যুক্ত হয়ে বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত দেয়ার কোন প্রয়োজন হবে না। সে যেই আকীদা-বিশ্বাস ধারণ করেছে এটার কারণেই তার ঈমান একেবারে বাতিল হয়ে যাবে এবং সে কাফের বলে গণ্য হবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদের কর্মের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন আকীদা বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি এতে বোঝা যায় জানা কিংবা বিশ্বাসের কোন প্রসঙ্গ এখানে জড়িত নেই বরং কর্মটাই এখানে সবচেয়ে বড় কুফরী। এর প্রতি ইঙ্গিত দেয়ার জন্যই তাআলা কর্মের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি।

আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলো কি শাসক শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত??? এই আয়াত দ্বারা তাদের পক্ষে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার কোন সুযোগ আছে কি?

১. রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের প্রকারভেদ।

সূরা মায়দার ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতের মর্ম, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ ক্ষেত্র ইত্যাদি বুঝতে হলে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের স্তরবিন্যাস বা প্রকারভেদ। এই বিষয়টি জানার দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো যে, আয়াতের আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কোন স্তরের সাথে সম্পৃক্ত? এবং কোন শ্রেণীর

লোকদের ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে? আর অবশ্যই এটা স্বতসিদ্ধ বিষয় যে, স্তর ও প্রকারের ভিন্নতার কারণে বিধানের মধ্যেও পার্থক্য হয়ে থাকে। ভিন্নতা যতো বেশি হবে পার্থক্যটা ততো বড়ো হবে। সকল স্তর ও প্রকারের বিধান এক অভিন্ন হবে এমন দাবি করা নিতান্তই বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সামান্যতম সচল বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এমন দাবি করতে পারে না। যাই হোক এখন আমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করে মূল মাসআলা শুরু করছি।

তাহকীম ও তাশরীঈ

রাষ্ট্রের মৌলিক বিভক্তি:

আমরা জানি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম মৌলিকভাবে তিনভাগে বিভক্ত। যথা:-

১. আইন বিভাগ। আরবীতে এটাকে বলে القسم التشريعي
২. বিচার বিভাগ। আরবীতে এটাকে বলে القسم القانوني
৩. নির্বাহী বিভাগ। আরবীতে এটাকে বলে القسم

১. আইন বিভাগের (القسم التنفيذي) কাজ হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন করা। বিচারকার্যের একেবারে মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ (তৈরি) করা। এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত লোকরা হলো সংসদ সদস্য, মন্ত্রী পরিষদ ও বিশেষ কিছু বুদ্ধিজীবী।

২. বিচার বিভাগের (القسم القانوني) কাজ হচ্ছে "আইন বিভাগে"র পক্ষ থেকে নির্ধারণকৃত সংবিধান ও নীতিমালার আলোকে "আবশ্যিক রূপে" যাবতীয় মামলা, মুকাদ্দামা'র সমাধান প্রদান করার মাধ্যমে বিচারকার্য

পরিচালনা করা। এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত লোকরা হলো; প্রধান বিচারপতি, তার সহযোগী ও প্রথম সারির বিচারক।

৩. নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে আইন বিভাগের মাধ্যমে প্রণয়নকৃত সংবিধানের ভিত্তিতে রায় প্রদানকারী বিচার বিভাগের দেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত লোকরা হলো; ্যাব, পুলিশ, সেনাবাহিনী সহ রাষ্ট্রের যেকোন স্বসন্ত্র বাহিনী এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোক। যেমন: মিডিয়া বিভাগ, সংস্কৃতি বিভাগ, সেবা ও শিক্ষা প্রদানকারী বিভাগের বিশেষ কিছু লোক ইত্যাদি। সুরা মায়েরদার যেই আলোচনা সেটা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় স্তর তথা "বিচার বিভাগে"র সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম বিভাগ তথা "আইন প্রণয়ন বিভাগে"র সাথে এই আলোচনার কোন যোগসূত্র নেই। এমনকি মুফাসসিরগণ, মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণসহ অন্যান্য শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণের প্রদানকৃত ব্যাখ্যার কোন সম্পর্ক নেই। এ বিষয়টি একেবারেই সুস্পষ্ট। কারণ "তাহকীম" তথা বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। "তাশরঈ" তথা আইন প্রণয়ন করা সম্পর্কে এখানে কোন আলোচনা করা হয়নি। মুফাসসিরগণ ও ফকিরগণের যেই ইখতেলাফ (মতপার্থক্য) আছে সেগুলো তাহকীম তথা বিচারিক কার্যক্রমের মধ্যে হঠাৎ সংঘটিত হওয়া বিশেষ একটা অবস্থার ব্যাপারে আলোচিত হয়েছে। নিয়ম তান্ত্রিকভাবে স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকা কোন অবস্থার ব্যাপারে এ কথাগুলো (ব্যাখ্যা) উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং মুফাসসিরগণের এই ব্যাখ্যাগুলোকে ঢালাওভাবে প্রয়োগ করা কিংবা বর্ণনা করার কোন সুযোগ নেই। তারপরেও যেহেতু কেউ কেউ ব্যপক ভাবে সেই কথাগুলোকে সামনে রেখে মতভেদ করে বলেছেন যে- কেউ ভিন্ন আইন দ্বারা বিচার করলে সে কাফের হবে কি হবে না সেটা নিয়ে ইখতেলাফ আছে, তাই এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করা জরুরী। যদিও কিছু ব্যক্তির করা এই ইখতিফের সুযোগ নেই। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, তাশরীঈ তথা আইন প্রণয়নের দ্বারা কাফের হয়ে যায় এ ব্যাপারে কেউ ইখতেলাফ

(দ্বিমত) পোষণ করেননি। আর কুরআনেও এ ব্যাপারে কোন ধরনের শিথিলতা করা হয়নি। বরং এটাকে (আইন প্রণয়নের করা) সুস্পষ্টভাবে কুফরে আকবর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যত জায়গায় আইন প্রণয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই বিনা ব্যাখ্যায় সেটাকে "কুফরে আকবর" হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। কোন ধরনের ব্যাখ্যার সুযোগ রাখা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি আয়াত দেখা যেতে পারে।

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নুহ'কে। এবং (হে রাসুল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট পৌঁছেিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছি ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে। (তা এই ছিল যে-) তোমরা দ্বীন কায়েম করো। আর তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। (তা সত্ত্বেও) আপনি মুশরিকদেরকে যেকোনো ডাকছেন তা তাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান বেছে নিয়ে নিজের দিকে টানেন। আর যে কেউ তার অভিমুখী হয় তিনি তাকে নিজের দিকে পৌঁছে দেন।" (সূরা শূরা:১৩)

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বরাত দিয়ে বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "আদ-দুররুল মানছুরে" উল্লেখ করা হয়েছে-

فَتَاةٌ: تَخْلِيلُ الْخَلَالِ وَتَحْرِيمُ الْحَرَامِ.

وَأُخْرِجَ عَبْدُ بَنٍ حُمَيْدٍ، وَأَبْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: بُعِثَ نُوْحٌ جَبِيْنٌ بُعِثَ بِالشَّرِيعَةِ بِتَخْلِيلِ الْخَلَالِ وَتَحْرِيمِ الْحَرَامِ

অর্থ: আল্লাহ তাআলা হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম রূপে চূড়ান্ত বিধান নির্ধারণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আবদ ইবনে হুমাইদ হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্র দিয়ে আরো বলেন:

হযরত নুহ আলাইহিস সালামকে যখন প্রেরণ করা হয়েছিল তখন হালালকে "হালাল" ও হারামকে "হারাম" রূপে সাব্যস্ত (বাস্তবায়ন) করার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল।

"দীন তথা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করে" আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে সা'দীতে বলা হয়েছে-

أَنْ أَقِيفُوا الدِّينَ}- أَي: أَمْرُكُمْ أَنْ تَقِيمُوا جَمِيعَ شَرَائِعِ الدِّينِ أَصُولَهُ وَفُرُوعَهُ، تَقِيمُونَهُ بِأَنْفُسِكُمْ، وَتَجْتَهِدُونَ فِي إِقَامَتِهِ عَلَى غَيْرِكُمْ، وَتَعَاوَنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُونَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

অর্থাৎ: দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত সকল কিছু নিজেদের মাঝে এবং অন্যদের মধ্যেও সেগুলো

বাস্তবায়ন (মেন চলার) করার আদেশ করেছেন। এবং পরস্পর ভালো কাজের আদেশ সহযোগিতা করবে আর কখনো মন্দ কাজের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সহযোগিতা করা যাবে না।

এ সম্পর্কে "অইসারুত তাফাসীর" গ্রন্থে বলা হয়েছে-

أَنْ أَقِيفُوا الدِّينَ}- وَهُوَ دِينٌ وَاحِدٌ قَائِمٌ عَلَى الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ لِلَّهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِقَامَةِ ذَلِكَ بَعْدَ التَّفْرِيطِ فِيهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَعَدَمُ التَّفَرُّقِ فِيهِ، لِأَنَّ التَّفَرُّقَ فِيهِ بِسَبَبِ تَضْيِيعِهِ كَلَّا أَوْ بَعْضاً

এটা হলো সেই দ্বীন (বিধান) যা ঈমান, তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্য তথা তার আদেশ নিষেধ পরিপূর্ণ রূপে পালনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দিন (বিধান) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না এবং কোন ধরনের মতনৈক্য (অবহেলা) করা যাবে না। কেননা মতভেদের (অবহেলা) কারণে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন অথবা আংশিক দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

দুররুল মানসুর

ইবনুল মুনিযির জাজিরাতুল অখলাকুলে বিশিষ্ট ফকীহ যারুফ ইবনে রুফাইঈ এর বরাত দিয়ে বলেন: আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেছেন এবং তার জন্য দ্বীন (জীবন পরিচালনার চূড়ান্ত বিধান) নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। তখন মানুষ নূহ আলাইহিস সালামের শরীয়ত (সংবিধান) অনুযায়ী চলতো। কিন্তু পরবর্তীতে জিন্দিকরা (মুরতাদ) এই ধারাকে নিভিয়ে (বাতিল) করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবাহানাতালা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন তখন মানুষ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া শরীয়ত (জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা) অনুযায়ী চলতো। কিন্তু জিন্দিকরা (মুরতাদ) তা নিভিয়ে (অকার্যকর) করে ফেলেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন এবং তার জন্য দ্বীন (পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান) নির্ধারণ করে দিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যিন্দিকরা মুরতাদ তা নিভিয়ে (বিলুপ্ত করে) দিল। অতঃপর আল্লাহ সুবাহানাতালা ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন এবং তার জন্য দ্বীন (জীবনাদর্শের রূপরেখা) নির্ধারণ করে দিলেন তখন মানুষ ঈসা আলাইহিস সালামের দিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতো। কিন্তু জিন্দিকরা (মুরতাদ) তা নিভিয়ে (বিলুপ্ত) করে ফেললো। (আর জেনে রাখো আল্লাহর নির্ধারণ করা

এই দ্বীন {জীবনবিধান} অকার্যকর হওয়ার আশঙ্কা একমাত্র জিন্দিক তথা নামধারী ধর্মানুসারীদের দ্বারাই হয়ে থাকে।

وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ فَقِيهِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ نُوحًا وَشَرَعَ لَهُ الدِّينَ فَكَانَ النَّاسُ فِي شَرِيعَةِ نُوحٍ مَا كَانُوا فَمَا أَطْفَأَهَا إِلَّا الزُّنْدَقَةُ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَكَانَ النَّاسُ فِي شَرِيعَةٍ مِنْ بَعْدِ إِبْرَاهِيمَ مَا كَانُوا فَمَا أَطْفَأَهَا إِلَّا الزُّنْدَقَةُ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُوسَى وَشَرَعَ لَهُ الدِّينَ فَكَانَ النَّاسُ فِي شَرِيعَةٍ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مَا كَانُوا فَمَا أَطْفَأَهَا إِلَّا الزُّنْدَقَةُ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ عِيسَى وَشَرَعَ لَهُ الدِّينَ فَكَانَ النَّاسُ فِي شَرِيعَةِ عِيسَى مَا كَانُوا فَمَا أَطْفَأَهَا إِلَّا الزُّنْدَقَةُ قَالَ: وَلَا يَخَافُ عَلَى هَذَا الدِّينِ إِلَّا الزُّنْدَقَةُ.

মাওয়ারদী

:وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ- وفيه وجهان-

أَخَذَهُمَا: لَا تَتَعَادَا عَلَيْهِ، وَكُونُوا عَلَيْهِ إِخْوَانًا، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ.

الثَّانِيَةُ: لَا تَخْتَلِفُوا فِيهِ فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مُصَدِّقٌ لِمَنْ قَبْلَهُ، قَالَهُ مُقَاتِلٌ.

"আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে না" এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহ দুটি মত উল্লেখ করেন। প্রথমটি হলো মুফাসসির আবুল আলিয়া রহিমাহুল্লাহ'র মত। তিনি বলেন- "তোমরা আল্লাহর দ্বীন (বিধান) বাস্তবায়নের ব্যাপারে (অবহেলা কিংবা কঠোরতার মাধ্যমে) সীমালংঘন করো না"। বরং এক্ষেত্রে তোমরা একে অপরের ভাই (সহযোগী) হও।

দ্বিতীয় মতটি হলো মুফাসসির আল মুকাতিল রহিমাহুল্লাহ'র মত। তিনি বলেন- অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন (বিধান) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তোমরা মতানৈক্য করো না। কেননা পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী আলাইহিমুস সালাম এগুলোর সত্যায়নকারী ছিলেন।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ
لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . [الشورى ২১]

অর্থ: তাদের অর্থাৎ কাফেরদের কি এমন শরিক আছে যারা তাদের জন্য এমন দিন স্থির করে দেয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ (নিজের পক্ষ থেকে) দেননি? যদি মীমাংসাকর বাণী স্থির না থাকতো তবে তাদের ব্যাপারটা চুকিয়েই দেয়া হতো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা শুরা: ২১)

তাফসীরে ইবনে কাসীর:

أَيُّ: هُمْ لَا يَتَّبِعُونَ مَا شَرَعَ اللَّهُ لَكَ مِنَ الدِّينِ الْقَوِيمِ، بَلْ يَتَّبِعُونَ مَا شَرَعَ لَهُمْ
شَيَاطِينُهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، مِنْ تَحْرِيمِ مَا
حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ

...

إِلَى نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ (৬) الْبَاطِلَةِ، الَّتِي كَانُوا قَدْ اخْتَرَعُوهَا
فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، مِنْ التَّخْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، وَالْعِبَادَاتِ الْبَاطِلَةِ، وَالْأَقْوَالِ الْفَاسِدَةِ.

অর্থ: এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য যেই দ্বীন (জীবন বিধান) নির্ধারণ করে দিয়েছেন তারা সেই দিনের অনুসরণ করত না। বরং তাদের মধ্য হতে যে সকল জ্বীন শয়তান এবং মানুষ শয়তান ছিল তারা তাদের তৈরি করা হালাল (বৈধ) ও হারামের (অবৈধ) মানদণ্ডরূপে যেই সংবিধান প্রণয়ন করত তারা সেগুলোর অনুসরণ করতো।

... এমনিভাবে জাহেলী যুগে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) তারা যে সকল ভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা ও বাতিল কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছিল, ইসলাম গ্রহণ করার পরও তারা সে সকল নিকৃষ্ট (কুফরী) কাজ যেমন: হালাল (আইনসম্মত) সাব্যস্ত করা, হারাম (আইন বিরোধী) প্রতিপন্ন করা, অন্যায় কর্মক্রম ও আনুগত্যে লিপ্ত থাকা এবং ফাসাদ (সিমান বিরোধী) কথাবার্তা বলা ইত্যাদি।

তাফসীরে বাগাবী:

يَغْنِي كُفَّارَ مَكَّةَ، يَقُولُ: أَمْ لَهُمُ آلِهَةٌ سَأُلُّوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ؟

অর্থ: অর্থাৎ তারা হলো মক্কার কাফের গোষ্ঠী আল্লাহ তা'আলা বলেন তাদের কি এমন কোন ইলাহ আছে যে তাদের জন্য দ্বীনের (ইসলামের) ওই অংশগুলো প্রবর্তন ও প্রণয়ন করে দেয়, যেগুলো নির্ধারণ করার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেয়নি?

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: شَرَعُوا لَهُمْ دِينًا غَيْرَ دِينِ الْإِسْلَامِ.

অর্থ: তারা (কাফেররা) তাদের (সাধারণ লোক) জন্য ইসলামের পরিবর্তে
ভিন্ন আরেকটি দ্বীন তথা "জীবনবিধান" নির্ধারণ ও প্রণয়ন করে দেয়।

আইসারুত তাফাসীর:

يقول للمشركين من كفار قريش شركاء من الشياطين شرعوا لهم دينا وهو
الشرك لم يأذن به الله، وهذا إنكار عليهم، وإعلان غضب شديد من أجل
شركهم الذي زينته لهم الشياطين فصرفتهم عن الدين الحق إلى الدين
الباطل،

অর্থ: আল্লাহ তাআলা বলেন কুরাইশ কাফেরদের মধ্যে থাকা মুশরিকদের
জন্য কি এমন কিছু শয়তান অংশীদার রয়েছে, যারা তাদের জন্য দ্বীন তথা
"জীবনাদর্শ" প্রবর্তন করে দেয়? এটা সুস্পষ্ট শিরক। এই ধরনের কর্মের
অনুমতি আল্লাহ তাআলা কাউকে দেননি। আল্লাহ তাআলা তাদের এই কর্মকে
ঘৃণার সাথে অপছন্দ করেছেন। এবং তাদের এই শিরকের কারণে তাদের
প্রতি প্রচণ্ড রাগ-গোষা ব্যক্ত করেছেন। এ ধরনের শিরকি কর্মকান্ডগুলো
শয়তান তাদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর এগুলো তাদেরকে
সত্য দ্বীন (ইসলাম) থেকে সরিয়ে মিথ্যা দ্বীনের ইসলামের বিপরিত আচরণ)
দিকে ধাবিত করেছে।

এ দুটি আয়াতের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, "আইন প্রণয়ন" তথা
সংবিধান তৈরি করা সরাসরি কুফরে আকবার। কারণ এটা দ্বীনের মৌলিক
বিষয়গুলোর অন্যতম। সালাত, সিয়াম ইত্যাদি বিষয়গুলোতে যেমন কেউ
হস্তক্ষেপ করতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে মৌলিক সংবিধানের ক্ষেত্রেও
কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। ইসলামের পক্ষ থেকে যে সংবিধান
(দ্বীন) দেয়া হয়েছে তার পরিবর্তে আরেকটি সংবিধান রচনা করা এতো

নিকৃষ্ট কাজ যে, শুধু এটা করার কারণেই মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। তার ঈমান একেবারে বাতিল হয়ে যায়। এবং সে কাফের বলে গণ্য হয়। এখানে নিয়ত তথা ইচ্ছা থাকার কোন প্রয়োজন হয় না। এমনকি সঠিক আকিদা বিশ্বাসের পরিবর্তন করে বাতিল আকিদা বিশ্বাস ধারণ করারও প্রয়োজন হয় না। যেমনিভাবে কেউ যদি আল্লাহর পরিবর্তে নিজের ইবাদাত করার জন্য অপরকে আহ্বান করে, তাহলে এ কারণে সে কাফের হয়ে যায়। চাই তার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক। এমনকি তার আকীদা-বিশ্বাসে যদি এটা বদ্ধমূলও থাকে যে- তার এই কাজটা কুফরী, এটা করা ঠিক না, এগুলো সব আল্লাহর অধিকার, এটা করে আমি অন্যায় করছি ইত্যাদি এ জাতীয় অনুভূতি তার মনে যতই শক্তিশালী রূপে উপস্থিত থাকুক না কেন, এই অনুভূতি আর আকীদা-বিশ্বাসের কোন মূল্যায়ন-ই হবে না। এগুলোর কোন ফলাফল ই গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ এই ধরনের আকীদা বিশ্বাসের কারণে সে কুফুরী থেকে মুক্ত হতে পারবে না। বরং ইসলাম থেকে ছিটকে পড়বে। তার ঈমান একেবারেই বাতিল হয়ে যাবে। সে নিকৃষ্ট কাফের হিসেবেই গণ্য হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আশা করা যায় এতক্ষণের আলোচনার দ্বারা আমাদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তারপরেও হয়তো কারো মনে এই সম্পর্কিত কিছু সংশয় বা অস্পষ্টতা থাকতে পারে। সেগুলো যেন দূর হয়ে যায় সেজন্য আরো দুটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ . [التوبة : ٣١]

অর্থ: তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আহবাব (ইহুদিদের ধর্মীয় আলেম) ও রুহবানদেরকে (খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু) "রব" বানিয়ে নিয়েছে। এবং মাসিহ

ইবনে মারিয়ামকেও (রব বানিয়ে নিয়েছে।) অথচ তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার আদেশ করা হয়েছে। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাদের অংশীবাদীসুলভ কথাবার্তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। (সূরা তাওবা: ৩১)

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হাদীস:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي غُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ: (اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَزُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

আদী বিন হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

একদা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এলাম। তখন আমার ঘাড়ে সোনার ত্রুশ ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, “হে আদী! এই প্রতিমা তোমার নিকট থেকে খুলে ফেল।” শুনলাম তিনি সূরা তাওবার এই আয়াত পাঠ করলেন,

اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَزُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পণ্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। (তাওবাহ:৩১)

আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখে উক্ত আয়াত শুনে আরজ করলাম যে, ইয়াহুদী-নাসারারা তো নিজেদের আলেমদের কখনো ইবাদত করেনি, তাহলে এটা কেন বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকে ‘রব’ বানিয়ে নিয়েছে? তিনি বললেন, “এ কথা ঠিক যে, তারা তাদের ইবাদত করেনি। কিন্তু এটা তো সঠিক যে, তাদের আলেমরা যা হালাল করেছে, তাকে তারা হালাল এবং যা হারাম করেছে, তাকে তারা হারাম বলে মেনে নিয়েছে। আর এটাই হল তাদের ইবাদত করা।” (তিরমিযী ৩০৯৫, সনদ: সহীহ।)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آلِهَةٌ لَا تُذُنْ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ. (يونس: ৫৭)

অর্থ: বলুন, চিন্তা করে দেখ তো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক নাযিল করেছিলেন, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছে! (এটা কি উচিত ছিল) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহই কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে? (সূরা ইউনুস: ৫৯)

প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى . شركائهم، ساء ما يحكمون

ফায়দা -

ইবাদাত ফলপ্রসূ হয় সঠিক আকীদা বিশ্বাস ধারণের ভিত্তিতে, কিন্তু কেবল সঠিক আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জানা বা বিশ্বাস করার দ্বারাই ইবাদাত আদায় হয় না। আরো সহজে বললে ইবাদতটাই হলো মূল। আর আকীদা বিশ্বাস হলো তার সূচনাস্থল, স্তম্ভ স্বরূপ, ফলাফল নির্ধারণের ভিত্তি, ইবাদাত ফলপ্রসূ হওয়ার মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা বলেন

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.

অর্থাৎ ইবাদাতের মাধ্যমে সঠিক আকীদা বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। একনিষ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এর বিপরীতে শুধুই সঠিক আকীদা বিশ্বাস ধারণ করার দ্বারা মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য (ইবাদাত ও আনুগত্য) পূর্ণ হয় না। সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের প্রকাশ-মাধ্যম হলো ইবাদাত তথা বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কাজকর্ম। এগুলোই হলো আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়ার প্রমাণ।

আল্লাহ সুবাহানাতালা বলেন:

الم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن
اعبدوني هذا صراط مستقيم.

وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان ،
للرحمن عصيا)

(وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ،

أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعہ. ولذا سمى الله تعالى
الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى:

.وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) (الآية)

এই আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই মানুষ কাফের হয়ে যেতে পারে আকিদা-বিশ্বাসের পরিবর্তনের কোন ধর্তব্য নেই। উল্লেখিত আয়াত গুলোতে আকিদা বিশ্বাসের ভ্রান্তির কথা উল্লেখ নেই বরং আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা তাদের (কাফের মুশরিক) অবাধ্যতামূলক আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও ইসলামবিরোধী অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় আকিদা-বিশ্বাস যতই ঠিক থাকুক যদি সেগুলোর দাবি অনুযায়ী জীবন যাপন না করে তাহলে সেই আকিদা-বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। যদি নিয়মতান্ত্রিক, ধারাবাহিকভাবে, ব্যাপকতার সাথে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কাজকর্ম, আচার-আচরণে লিপ্ত থাকে, তাহলে তার কাফের হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। আকিদা বিশ্বাসের পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় না। এই উদাহরণ কুরআন-সুন্নাহ সহ অসংখ্য কিতাবাদীতে বিদ্যমান। তার মধ্য হতে কিছু হলো এই যে- ইবলীস, ফেরাউন, আবু তালেব, মক্কার কতক মুশরিক, মাদীনাহ ও তার বাহিরের কত ইহুদি-খ্রিস্টান।

ফলাফল :

আইন প্রণয়নের অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে- সে আল্লাহর আনুগত্য করতে রাজি না। আল্লাহর বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে। এই ধরনের আচরণের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আল্লাহদ্রোহিতা সাব্যস্ত হয়। এখানে নিয়ত থাকা না থাকার কোন পার্থক্য নেই।

যেমন মনে করুন, আপনি কোন একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক। সেই প্রেক্ষিতে আপনি কিছু নিয়মকানুন তৈরি করলেন। কিন্তু অপর আরেকজন এসে আপনার এই নিয়মকানুন সব বাতিল করে দিল। সাথে এই স্বীকৃতিও দিল যে- আমি জানি এবং মানি এটা আপনার প্রতিষ্ঠান। এখানে সব অধিকার আপনার। সবকিছু আমি মানি। একথাগুলো বলার সাথে সাথে সে যদি অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে বিরত না হয়, বরং নিজেই সেটার উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। যেমন কোম্পানির নিয়ম-কানুন কি হবে? কাকে নিয়োগ দেয়া হবে? কাকে বাদ দেয়া হবে? কার বেতন কত হবে? ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি সে নিজের মত করেই সিদ্ধান্ত দিতে থাকে, মূল মালিকের নিষেধাজ্ঞার কোন পরোয়া না করে, তাহলে এই অধিকার কি তাকে দেয়া হবে? নাকি তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হবে? তাকে দখলদার, অবৈধ হস্তক্ষেপকারী বলে চিহ্নিত করা হবে, নাকি তার সহযোগী, হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে গণ্য করা হবে?

তার এই আচরণ ও কর্মকাণ্ডের ফলাফল এই যে- সে মুখে নিজের মালিকানা দাবি না করলেও তার কাজকর্ম, আচার-আচরণের মাধ্যমে নিজের অধিকার দাবি করে যাচ্ছে। এখানে আরো একটি বিষয়ের লক্ষণীয় হলো- উক্ত ব্যক্তির যদি এ ধরনের স্বেচ্ছাচারীমূলক আচার-আচরণের পাশাপাশি কোম্পানির মালিকানার প্রমাণ স্বরূপ "কাগজপত্র" নিজের নামে করে নেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার এই অপরাধ কি আগের অপরাধের সমান বলে গণ্য হবে,

নাকি তার থেকে বেশি মারাত্মক ও ভয়ানক অপরাধ বলে গণ্য হবে? এ ধরনের মারাত্মক অপরাধ করার মুহূর্তেও যদি সে চিৎকার করে বলতে থাকে যে, "আমি বিশ্বাস করি যে এ কোম্পানির মালিক আপনি এবং এটা স্বীকারও করি", তাহলে কি তার এ কথার প্রতি কোন ড্রফ্ফপ করা হবে! এই আচরণকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হবে, নাকি এগুলোকে উপহাসমূলক কথা, ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গাত্মক আচরণ বলে গণ্য করা হবে?

সুতরাং যারা আল্লাহর আইনকে চূড়ান্ত রূপে বাতিল ঘোষণা করেছে, তদস্থলে আরেকটি আইন প্রণয়ন করেছে তারা কিভাবে ক্ষমার যোগ্য হতে পারে? এমনিভাবে যারা ধারাবাহিক ও নিয়ম তান্ত্রিক কর্মের মাধ্যমে এগুলো অনুসরণ করে যাচ্ছে, প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে লিপ্ত রয়েছে, তারা এই অবস্থার উপর বহাল থাকার পরেও তাদের মুখের কথা আর অন্তরের বিশ্বাসের কি গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে? এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে উপহাস বৈ আর কি? ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে ধোঁকা, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য আর কি হতে পারে?

দ্বিতীয় স্তরের লোকদের প্রসঙ্গ

বর্তমান সময়ে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যারা মৌলিক বিচারকার্যের সাথে জড়িত তাদের ক্ষেত্রেও এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। এর কয়েকটি কারণ হলো; যথা:-

ক. এটাকে স্বাভাবিক নীতি ও সাধারণ অবস্থা ভাবা এবং কোন ধরনের সংকোচবোধ না থাকা।

খ. নিয়মতান্ত্রিকভাবে, ধারাবাহিকতার সাথে এই কার্যক্রমে লিপ্ত থাকা।

গ. অপরাধবোধের অনুপস্থিতি ও দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীনতা।

ঘ. জরুরীয়াতে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবহেলা।

ঙ. দ্বীন তথা ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ না করে, নিজেদের পছন্দমত গুটিকয়েক বিষয়ের মধ্যে সংকুচিত করে ফেলা।

উল্লেখিত এই বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি এতো মারাত্মক যে, এগুলোর যেকোনো একটির কারণেই ব্যক্তির ঈমান বাতিল হয়ে যায়। এবং এগুলোর কারণে বাহ্যিকভাবে ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে মুক্ত, বহিষ্কৃত বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করার ক্ষেত্রেও শরীয়তের কোন বাঁধা থাকে না। কারণ পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর কুফরীর অবস্থা এরকমই ছিল যে তারা মৌখিকভাবে বা বিশ্বাসগতভাবে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করত না বরং তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আচার-আচরণের মাধ্যমে তাঁর অবাধ্যতা করতো। আর এই আচরণগত কারণেই আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা তাদেরকে অবাধ্য কাফের বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর কুফরের ধরণ:

অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাফের জাতিগোষ্ঠীর অবাধ্যতা তথা কুফরের ধরণ কেমন ছিল? তাদের অবাধ্যতা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে জড়িতে ছিল, নাকি কাজকর্ম, আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল? এই বিষয়টি বুঝার জন্য উদাহরণ স্বরূপ কুরআনের কয়েকটি আয়াত দেখতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা বলেন:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُشْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُؤْخِرُ
[إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيَجْذَلُوهُمْ وَإِنَّ أُطْغَمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ]. [الأنعام ١٢١]

অর্থ: যে পশু আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়নি তা তোমরা খেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা (ভক্ষণ করা) কঠিন অপরাধ। (হে মুসলিমগণ!) শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিতর্ক করার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকে। যদি তোমরা তার কথামতো চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আনআম- ১২১)

এই আয়াতের তাফসীর অধ্যয়ন করলে বিষয়গুলো একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে এখানে শুধু এতোটুকুই লক্ষণীয় যে- আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কাজকর্মের কারণেই মুশরিক বলে উল্লেখ করছেন। সাধারণ আনুগত্যকেই ঈমান বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণ বলা হয়েছে। আকীদা-বিশ্বাসের কোন প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করা হয়নি।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ [النحل ৯৭-১০০]

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে, তাদের উপর তার কোন আধিপত্য চলে না। তার আধিপত্য চলে কেবল এমন সব লোকের উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরকে লিপ্ত। (সূরা নাহল: ৯৯-১০০)

এই আয়াতের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে কারো ভিতরে যদি সামান্যতম ঈমান ও অবশিষ্ট থাকে তাহলে সে কখনো সর্বদা তাগুতের (গাইরুল্লাহর) আনুগত্যে নিজেকে লিপ্ত রাখতে পারে না। উদাসীনতা ও নিঃসংকোচতা

তার মাঝে থাকতে পারে না। আল্লাহর আদেশকে উপেক্ষা করে তাগুতের অধীনে থেকে স্থায়ীভাবে তাদের আনুগত্যে নিজের জীবনকে পরিচালনা করতে পারে না। যার মাঝে সামান্যতম ঈমান থাকবে তার মাঝে এই অবস্থাগুলো কখনোই ঘটতে পারে না। আযাতের বক্তব্য দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় সুতরাং আমাদের চিন্তা করা উচিত

এই আযাতটা শেষে উপদেশের জন্য।

تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ
[الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ]- [النحل ٦٣]

অর্থ: (হে নবী!) আল্লাহর কসম! আপনাদের পূর্বে যেসব জাতি গত হয়েছে, আমি তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদের সামনে চমৎকার রূপে তুলে ধরেছিল। সুতরাং সে-ই (শয়তান) আজ তাদের অভিভাবক এবং (এ কারণে) তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাময়। (সূরা নাহল: ৬৩)

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَذْنَ
بِالْأَذْنِ وَاللسنَّ بِاللسنِّ وَالْجُزُوعَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ - فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُۥ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]- [المائدة ٤٥]

অর্থ: এবং আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের

বদলে কান ও দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমে ও (অনুরূপ) বদলা নেওয়া হবে। অবশ্য যে ব্যক্তি তা (অর্থাৎ বদল) ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা জালিম। (সূরা মায়দা: ৪৫)

এই আয়াতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আকীদা বিশ্বাসের পরিবর্তে শুধু বাহ্যিক কর্মকান্ড ও আচরণগত কারণে তাদেরকে কাফের আখ্যা দেয়া হচ্ছে।

পূর্ববর্তী জাতি ও ধর্মের লোকদের কুফরীর একটি দিক এই ছিল যে, তারা দ্বীনের কোন একটা অংশকে অস্বীকার করতো, সকল বিষয় অস্বীকার করতো না। অর্থাৎ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত বিষয়কে দ্বীনের অংশ মনে করত না বা জরুরী মনে করত না। যেমন: মুশরিকরা। তাদের এক শ্রেণী ছিল যারা আখেরাতকে অস্বীকার করতো। আরেক শ্রেণী ছিল যারা আখেরাত স্বীকার করতো, তবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাতকে অস্বীকার করতো। ইহুদীরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনা এবং তার আদর্শ গ্রহণ করাকে অস্বীকার করেছে। এরকমভাবে পূর্ববর্তী জাতি ও ধর্মের লোকেরা দ্বীনের এক একটা বিষয়কে অস্বীকার করেছে। এবং সেই ভিত্তিতে তারা কাফের সাব্যস্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ দ্বীনকে কেউ অস্বীকার করেনি। দ্বীনের প্রত্যেকটা বিষয়কে অবহেলা বা বর্জন করার কারণে কাউকে কাফের বলা হয়নি। বরং আংশিক অস্বীকার করার ভিত্তিতে তারা কাফের হয়েছে।

আর আমাদের অবস্থা হলো এই যে, আমরাও সেই পূর্ববর্তী কাফের জাতি-গোষ্ঠীর মতো আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে শুরু করেছি! আমরা হয়তো নাস্তিকদের মত আখেরাতকে অস্বীকার করি না, আমরা হয়তো মুশরিকদের মত সরাসরি মূর্তির পূজা করি

না, আমরা হয়তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা তার প্রতি
নযিল হওয়া কুরআনকে গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করিনি, কিন্তু
আমরা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশকে অস্বীকার করি, যেটা খুবই
গুরুত্বপূর্ণ। যেটা অস্বীকার করার কারণে ইহুদি খ্রিস্টানরা কাফের সাব্যস্ত
হয়েছে। সেটা হলো আইন প্রণয়ন করা অথবা বলা যায় আমরা মনে করি
জীবনের সব অংশে দ্বীনের কর্তৃত্ব নেই। দ্বীন শুধু বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে
ভূমিকা রাখবে। জীবনের সকল অঙ্গনে এটা আসতে পারে না। বা এটা মানা
জরুরি না। মানলেও চলে না মানলেও চলে। গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা
ও গ্রহণ করার কিছু নেই। আজ আমাদের ভাবনা (প্রকৃত আকীদা-বিশ্বাস
এরকমই! ঈমান সমূলে ধ্বংস হওয়ার জন্য এতটুকই যথেষ্ট। ইসলাম থেকে
বহিষ্কৃত গণ্য হওয়ার জন্য এর বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। অথচ আমরা
উদাসীন! নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বসে আছি।
নিজেদেরকে পাক্লা মুমিন ভাবছি।

অমাদের "দ্বীন অস্বীকার করার" ধরন হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে
আমরা দ্বীনের নিয়ন্ত্রণকে জরুরী মনে করি না। সেটার সাথে জীবনের
অপরিহার্য সম্পর্ক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা নামাজ এবং
বিচারকার্যের মধ্যে পার্থক্য করে থাকি। অথচ এখানে এই পার্থক্যের কোন
সুযোগ নেই। আমরা বিবাহ-সাদী আর অর্থনীতির মাঝে পার্থক্য করে থাকি।
অথচ এখানে পার্থক্যের কোন সুযোগ নেই। এককথায় বলতে গেলে
ব্যক্তিগত বিষয়ে দ্বীনকে আমরা জরুরী মনে করি, আর ব্যক্তি-জীবনের
বাহিরে "সমাজ এবং রাষ্ট্রের" ক্ষেত্রে দ্বীনকে জরুরী মনে করি না। বরং
সেগুলোকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কোন অংশই মনে করি না। অস্বীকার করি!
যেমনভাবে কাফের মুশরিকদের কেউ আখেরাতকে অস্বীকার করে, কেউ
মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করে, কেউ কুরআনকে
অস্বীকার করে কেউ একত্ববাদকে অস্বীকার করে ইত্যাদি আমরাও ঠিক
তেমনি নিজেদের দ্বীনকে অস্বীকার করি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে

ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কার্যত অস্বীকার করে যাচ্ছি!

ফলাফল:

বিচার বিভাগের প্রথম স্তরে থাকা জজ ও তাদের সমপর্যায়ের লোকদের ক্ষেত্রেও এই আয়াতের তাফসীর প্রযোজ্য নয়। কারণ সাহাবায়ে কেলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুরু করে সকল মুফাসসির ও ফকিরগণ এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা ছিল ওই সমস্ত বিচারকদের জন্য ছিল;

ক. যারা ওই শাসকদের প্রতিনিধি হিসেবে "বিচার বিভাগে" বিচারিক কার্যক্রম করার জন্য নিয়োগ হয়, যারা শরীয়তের ভিত্তিতে ইসলামী আইনকেই একমাত্র সংবিধান রূপে বহাল রাখে।

খ. যারা ইসলামের ভিত্তিতে শরয়ী আইনকে অপরিহার্য জেনে বিচারকার্য পরিচালনা করার কাজে নিয়োজিত হয় এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (শপথ গ্রহণকারী) হয়।

গ. যারা ইসলামী সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, সম্মান প্রদর্শন ও পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা এবং সাধারণ নীতি অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে আল্লাহর নির্ধারণ করা সংবিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করতে।

ঘ. যারা ব্যক্তি পর্যায়ের কোন কারণে (সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় চাপের কারণে নয়) হঠাৎ গোজামিল দিয়ে আল্লাহর নির্ধারণ করা সংবিধানের বিপরীত

বিচার ফায়সালা করতে। যেমন স্বজনপ্রীতি, পার্শ্ব সুযোগ-সুবিধা লাভ করা, কিংবা পদ-পদবী অর্জন করা ইত্যাদি।

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফায়সালা দেয়াকে "স্থায়ীভাবে" "সাধারণ নীতি" হিসেবে গ্রহণ করেনি। প্রকাশ্যে আল্লাহর আইনের "বিপরীত আইন" প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। এবং আল্লাহর আইনকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে বিপরীত আইনকে প্রাধান্য দেয়নি। তবে ঘটনাক্রমে প্রবৃত্তির তাড়নায়, নফসের প্ররোচনায় হঠাৎ কিছু বিচ্যুতি ঘটেছিল।

উল্লেখিত এ সকল অবস্থা ও গুণাবলীর অধিকারী সেই বিচারকদের অবস্থা প্রতি লক্ষ্য করেই যুগে যুগে মুফাসসিরগণ ও ফকীহগণ আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং এই ব্যাখ্যা একমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য। বর্তমান বিচারকদের জন্য নয়, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী সেই বিচারকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখনকার এই বিচারকদের মাঝে সম্পূর্ণ বিপরীত গুণাবলী বিদ্যমান এবং তারা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক অবস্থার উপর অটল অবিচল। সামনের আলোচনার দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে, বি-ইহনিগ্লাহ।

পূর্বের আলোচনার দ্বারা আমরা জানতে পারলাম এবং আমাদের নিকট সুপ্রমাণিত হলো যে- সূরা মায়েরদার এই তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যাগুলো প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। এমতাবস্থায় প্রসঙ্গতই একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে- এই আয়াতের সকল অবস্থাই যদি কুফরে আকবার (বড়ো কুফর) হয় আর কুফরে আসগরের (ছোট কুফর) কোন সুযোগ না থাকে এবং এর দ্বারা যদি ব্যক্তি ইসলাম থেকে বহিস্কৃত (মুরতাদ) সাব্যস্ত হয়, তাহলে এই আয়াত প্রসঙ্গে হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র পক্ষ থেকে "কুফর দুনা কুফুর" (ছোট কুফর) এর যেই ব্যাখ্যা আছে, সেটার তাৎপর্য কী? কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযুক্ত? নাকি সেটা অনুপযুক্ত, বাতিল? যদি বাতিল না হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কোন লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কোন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর বক্তব্যের তাৎপর্য ও প্রয়োগ ক্ষেত্র বোঝার জন্য এই আয়াত প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র ব্যাখ্যাটা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র বক্তব্যের মর্ম ও তাৎপর্য:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র এই বক্তব্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বিষয় আছে। সেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে। যথা:-

ক. কোন প্রেক্ষাপটে তিনি এ কথা বলেছেন?

খ. কোন বিভাগের লোকদের ক্ষেত্রে বলেছেন?

গ. কী ধরনের গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বলেছেন?

ঘ. এই বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র এই বক্তব্যের (ছোট কুফর) বিপরীত কোন বক্তব্য আছে কিনা?

ঙ. যদি বিপরীত বক্তব্য থাকে তাহলে উভয় কথার মাঝে মিল বা সামঞ্জস্যতা আসবে কিভাবে?

চ. দুই ধরনের বক্তব্যের কোনটি বেশি শক্তিশালী?

ছ. প্রমাণের দিক থেকে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য?

জ. সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় বর্তমানে কোনটির প্রয়োগ যথার্থ ও অধিক উপযোগী হয়?

ইবনে আবী হাতেম বলেন: মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-মুকরী আমাদেরকে বলেছেন- সুফিয়ান আমাদেরকে হিশাম ইবনে জাখীরের সূত্র ধরে তাওউসের মাধ্যমে ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে তার বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন:

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.

(অর্থ: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারণ করা সংবিধান দ্বারা বিচার করে না তারাই কাফের"।)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এটি ওই কুফর নয় যা তারা ব্যক্ত করে।" (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ৪/১১৪৩, হাদিস নং ৬৪৩৪, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৪২৭, হাদিস নং ৩২৬৯)।

ফলাফল:

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা "يذهبون" (তারা যেই উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে) বলে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং তাদের অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উমারী খিলাফতকালে সর্বত্র যখন আল্লাহর আইনই সু-প্রতিষ্ঠিত, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হুদুদ কিসাসই যখন কার্যকর হচ্ছিলো, তখন কোনো কোনো ওয়ালী (গভর্নর) বা কাযী (বিচারক) শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজেদের কুপ্রবৃত্তির কারণে আল্লাহর আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেয়ার পরিবর্তে হঠাৎ বিপরীত

কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতে, এর থেকে বেশী কিছু ছিল না। যেমন আল্লাহর আইন কে বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়ন করা কিংবা স্বাভাবিক ভাবে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য আইন দ্বারা বিচার করা ইত্যাদি। এতেই খাওয়ারেজ সম্প্রদায়ের লোকেরা উল্লিখিত আয়াতটির অপব্যবহার আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে কাফের আখ্যা দিতে লাগলো। তাদের এই অবস্থানকে প্রত্যখ্যান করতে গিয়েই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন- কুফর দুনা কুফর তথা কুফরে আসগর। একারণে ওই গভর্নর বা কাযীরা কাফের হবে না, বরং ফাসেক হবে।

কুফরে আকবর ও কুফরে আসগরের ক্ষেত্র

সুতরাং বুঝা গেলো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র এই কথা বিশেষ কিছু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বলেছেন। ঢালাওভাবে সকল স্তরের ও বৈশিষ্ট্যের লোকদের জন্য বলেননি। তাই যে কারো ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র ব্যাখ্যা প্রদান করার সুযোগ নেই। বরং কেউ যদি এমন করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে হয়তো মুখতাসুলভ আচরণ করলো, নয়তো কুরআন-সুন্নাহর অপপ্রয়োগ করে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করলো!

যদি ধরে নেয়া হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র এই কথাটি দ্বারা দুই ধরনের উদ্দেশ্যই (বড় কুফর ছোট কুফর) নেয়ার সুযোগ আছে, তাহলে অবশ্যই দেখতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে তার কথাটা কোন ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য এবং অধিক উপযোগী?

ইতিহাস থেকে

আমরা একটু পেছনে ফিরে যাই। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে উসমানী খিলাফত পতনের আগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে হাজারো যুলুম-অত্যাচার, অন্যায়- অবিচার হওয়া এবং শেষদিকে এসে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা ভঙ্গুর হয়ে পড়া সত্ত্বেও খিলাফতের পক্ষ হতে হুদুদ-কিসাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরয়ী আইন বলবৎ ছিলো। জিহাদি কাফেলা ছিলো। 'রিবাত'র ব্যবস্থাও ছিলো। শরয়ী আইনের বিপরীত কোনো মানবরচিত আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। সে সময়ে কোনো কাযী নিজে গোনাহে লিপ্ত হচ্ছে, ধোঁকায় পড়ে কখনো শরীআতের বিপরীত ফয়সালা করছে, একারণে উলামায়ে কেরাম তাকে ফাসেক হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন।

এর বিপরীতে যখনই শাসক কর্তৃক "ইয়াসাকে"র মতো কোনো মানবরচিত সংবিধান তৈরি হয়েছে, তখনই উলামায়ে কেরাম তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব বলে ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপট:

এখন আমরা একটু বিবেচনা করি; আমাদের দেশসহ কথিত মুসলিম বিশ্বের সরকার ও বিচার ব্যবস্থাপনা কোন প্রকারে পড়বে! যেখানে কুরআন-সুন্নাহর সংবিধানকে বিলুপ্ত করে তদস্থলে মানবরচিত সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেটাকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহর দেয়া শরীআতের (সংবিধান) সাথে বিদ্রোহ করে তাগুতের নীতিমালার উপর সংবিধান তৈরি করা হয়েছে। শরয়ী বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেয়ার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করা আবশ্যকীয় মনে করা তো দূরের কথা; বরং তার বিপরীতে মানবরচিত আইনে ফয়সালা করাকে বিচারকরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করছে। এই যখন অবস্থা তখন এটা কোন প্রকারে পড়বে? কথিত মুসলিম বিশ্বের সংবিধান ও তাতারিদের "ইয়াসাক" এর মাঝে পার্থক্য কোথায়?

সংশয় নিরসন:

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে তা আল্লাহর শরীয়তের উপরই অবিচল ছিলো। এ অবস্থার উপরই খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ অতিবাহিত হয়েছে। অতপর উমাইয়্যা খুলাফারাও এভাবে চলেছেন, যদিও তাদের থেকে বিভিন্ন বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যে সংবিধানের কাছে তারা বিচারপ্রার্থী হতো, তা আল্লাহর বিধি-বিধানই ছিলো। আল্লাহর শরিআতের পতাকাতলে তাদেরকে আশ্রয় দিতো এবং শরীয়তের হিকমত ও ইনসাফের মাধ্যমে তাদেরকে পরিচর্যা করতো। অতঃপর আব্বাসী খিলাফতের সূচনা হলো। তখনো মৌলিকভাবে বিচারব্যবস্থা শরীআতে ইসলামিই ছিলো। তবে সামান্য কিছু বিচ্যুতি ছিল সেটা ভিন্ন বিষয়।

অতঃপর তাতারীদের উত্থান হলো এবং হালাকু খান "ইয়াসাক" নামক সংবিধান প্রণয়ন করলো। "ইয়াসাক" সংবিধান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মন্তব্য বিশেষভাবে সঙ্গত স্থানে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইরতিদাদের নতুন দরজা:

মুসলিমদের জীবনে যেই অবস্থা নতুনভাবে দেখা দিয়েছে সেটা হলো; "বিচারকার্য থেকে আল্লাহর শরীয়তকে বাতিল করে ফেলা"। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম বিপর্যয়। ইতিপূর্বে এ ধরনের দুর্ঘটনা উম্মাহর মাঝে দেখা যায়নি।

আয়োজন করে পরিকল্পিতভাবে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে মানব রচিত আইন স্থাপন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলামকে পশ্চাদমুখী, সেকেলে, সভ্যতার উন্নতি ও বিবর্তিত কালের সহযাত্রী হতে পারছে না ইত্যাদি বলে

আখ্যা দেয়া হয়েছে। এটি মুসলিম জীবনে “ইরতিদাদ” তথা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের নতুনরূপ। কেননা তা শুধু এ সকল অসার দাবিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং শরীয়তকে কার্যকরীভাবে বাস্তব জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি চিন্তা-চেতনা (আকিদা-বিশ্বাস) থেকেও তা বিলুপ্ত করে ফেলা হয়েছে। পক্ষান্তরে শরীয়তের পরিবর্তে নিকৃষ্টতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। সেগুলোকে মেনে নেয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। ইসলামী সংবিধানের

পরিবর্তে সেখানে স্থান করে নিয়েছে ফরাসি, ইংরেজি, মার্কিন, কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্র এবং এ জাতীয় বিভিন্ন জাহেলী কুফরী শাসনব্যবস্থা। বস্তুত এই মতবাদগুলোর প্রত্যেকটি একেকটা স্বতন্ত্র ধর্ম, যা ইসলামের বিপরীতে তৈরি করা হয়েছে। মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার জন্য কিন্তু এগুলোকে ধর্ম বলে উল্লেখ না করে সাধারণ মতবাদ ও চিন্তাধারা নাম দিয়ে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ যুগে ফেতনার প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ধরণ ও মাধ্যম হচ্ছে এই যে- প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় এবং উদ্দেশ্য গুলো ফুটে ওঠে এ ধরনের শিরোনাম ও শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে, চাকচিক্যপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও দায়িত্ববোধ ও আবেগ জাগ্রতকারী বিভিন্ন শিরোনাম ও শব্দ ব্যবহার করা হয়!

ইনসাফপূর্ণ আচরণ কোনটি?

এখন সুস্থ বিবেক সিদ্ধান্ত দিবে এক্ষেত্রে ইনসাফ কোনটি? খাওয়ায়েজ সম্প্রদায়ের "ইফরাত" তথা বাড়াবাড়ি'র গোমরাহি যদি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে যারা “ইয়াসাকে”র উত্তরসূরীদের কাফের মানতে প্রস্তুত নয়; তাদের এই "তাহরীত" তথা ক্ষতিকর শিথিলতা'র গোমরাহি কি ভয়ঙ্কর নয়? এবং এটি কি "ইজমা" (ইমামগণের ঐক্যমত) এর পরিপন্থী নয়?

সালাফগণের মতামতগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত নয়! এক্ষেত্রে মহান ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ'র ফতোয়া উল্লেখ না করলেই নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"তাতাররা দুটি সাক্ষ্যের কথা বলে (কালিমা পাঠ করে), এবং তা সত্ত্বেও, তাদের সাথে লড়াই করা মুসলমানদের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি কর্তব্য। (ইবনে তাইমিয়ার মহান ফতোয়া। (২/৩২)

“তাতারীরা মুখে "শাহাদাতাইন" উচ্চারণ করে, তবুও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতে তাদের মোকাবেলায় কিতাল করা ওয়াজিব। (আল-ফাতাওয়ালাল কুবরা ২/৩২)।

উল্লেখ:

ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাসীর সেই শতাব্দীর দুই মনীষা, যেই শতাব্দীতে তাতারীরা তাদের পূর্ব কুফর থেকে ফিরে আসলেও আল্লাহর আইনের পরিবর্তে "ইয়াসাক" নামক মানবরচিত সংবিধান থেকে ফিরে আসেনি। ফলে তারা তাদের ব্যাপারে অধিক অবগত ছিলেন এবং সেই ভিত্তিতে ফতোয়া প্রদান করেছেন। আর তাদের এই ফতোয়ার বিষয়ে পরবর্তী ইমামগণ "ইজমা" (একমত) পোষণ করেছেন। আমাদের জানা মতে আজ পর্যন্ত কেউ তাদের এই ফতোয়া ও ইজমা'র ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। প্রত্যাখান করা তো দূরের কথা।

মূলকথা:

উক্ত আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র এই বক্তব্যের (ছোট কুফর) সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়। যথা:-

(ক) কোন প্রেক্ষাপটে তিনি এ কথা বলেছেন?

উত্তর: যখন ইসলামের প্রতাপে সকল কাফের জাতিগোষ্ঠী থরথর করে কাঁপছিল আর মুসলিম উম্মাহ খিলাফাহ'র ভূমিতে আল্লাহর আনুগত্য করত: সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করছিল এবং সর্বত্র তাওহীদ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠা খারেজী মতবাদের কিছু লোক ফিতনা সৃষ্টির পায়তারা করে যাচ্ছিল। ফলে সমাজে সামান্য অসংগতি দেখলে সেগুলোকে কুফরে আকবর গণ্য করে দাঙ্গা শুরু করতে চাইতো। এধরনের ইসলাম বিরোধী আবেগ, ষড়যন্ত্র ও অনিষ্টতা ছড়ানোর চেষ্টা করছিল, তখন তাদেরকে দমন করার জন্য তিনি রাদিআল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতের এই ব্যাখ্যা (ছোট কুফর) করেছেন।

খ. কোন বিভাগের লোকদের ক্ষেত্রে বলেছেন?

উত্তর: রাষ্ট্রের দ্বিতীয় স্তরের লোক তথা কাযী বিচারকদের ক্ষেত্রে বলেছেন, যারা খলীফাহ'র পক্ষ থেকে নিয়োজিত খিলাফাহ'র অধিনস্ত ভূখণ্ডগুলোর বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

গ. কী ধরনের গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বলেছেন?

উত্তর: যারা ইসলামী সংবিধানের আলোকে বিচার ফায়সালা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এবং একমাত্র শরয়ী আইন-কানুনকেই বিচারকার্যের নীতিমালা হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতো।

ঘ. এই বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু'র এই বক্তব্যের (ছোট কুফর) বিপরীত কোন বক্তব্য আছে কিনা?

উত্তর: এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায় এবং একাধিক বিবেচনায় সেটা "ছোট কুফর" এই ব্যাখ্যা থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য।

ঙ. সেই বিপরীত বক্তব্য (ব্যাখ্যা) কী?

উত্তর: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র সেই মত যা নব্য মুরজিয়া গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে বিলুপ্ত করে ফেলেছে তা হলো এই যে-

فقد عارضه عبد الله بن طاووس فروى عن أبيه قال:

سئل ابن عباس عن قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}.

1. قال: (هي كفر)2. وفي لفظ: (هي به كفر).

3. (وأخر: (كفى به كفره)

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস পূর্বের মতটি (ছোট কুফর) নাকচ করে দেন। অতঃপর তিনি নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাসকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর এই আয়াতের (অর্থ: যারা আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করে তারা কাফের।)

ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন: "এটা সুস্পষ্ট কুফর"। অপর বর্ণনায় আছে "এ কারণেই সে কাফের হয়ে যাবে"। আরেক বর্ণনায় আছে "তার কুফর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকিই যথেষ্ট"।

[আব্দুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর এবং ওয়াকীঈ সহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ "সহীহ সনদে" এটা বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, "ছোট কুফর" এর পক্ষে যেই বর্ণনাটি আছে সেটার সনদ (সূত্র) দুর্বল।]

চ. উভয় ব্যাখ্যার মাঝে মিল বা সামঞ্জস্যতা আসবে কিভাবে?

ছ. সনদ ও শব্দের বিবেচনায় দুই ধরনের বক্তব্যের কোনটি বেশি শক্তিশালী?

উত্তর: আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করা "ছোট কুফর" এই ব্যাখ্যার থেকে ওই ব্যাখ্যা ও বক্তব্যই বেশি শক্তিশালী যেখানে তিনি এই বিষয়টাকে "বড় কুফর" বলে উল্লেখ করেছেন।

জ. অনুসরণের দিক থেকে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য?

উত্তর: সামগ্রিক বিবেচনায় দ্বিতীয় মতটিই (বড়ো কুফর) অধিক গ্রহণযোগ্য। (এই বিষয়টি সামনের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।)

ঝ. সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় বর্তমানে কোনটির প্রয়োগ যথার্থ ও অধিক উপযোগী?

উত্তর: বর্তমান পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট এবং লোকদের অবস্থার কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায় ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র দ্বিতীয় মতটিই (বড়ো কুফর) অধিক উপযোগী ও প্রয়োগযোগ্য। বরং একথা বললেও ভুল হবে না যে, একমাত্র এই মতটিই গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এর বিপরীতটি নয়।

তাহলে কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

এই প্রশ্নের উত্তরটা অত্যন্ত অনুতাপ, আফসোস, পরিতাপ ও সংকোচবোধের সাথে দিতে হচ্ছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র এই ব্যাখ্যার (কুফর দুনা কুফর) গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার জন্য নূন্যতম যেই অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকা দরকার তার কোনটাই নেই। ফলে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা তো দূরের কথা উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আর ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ব্যাখ্যা প্রয়োগ করার জন্য কী ধরনের পরিবেশ, অবস্থা, গুণাবলীর সম্পন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণী হওয়া দরকার সেটা আমরা পূর্বেই জেনেছি। তবুও আরেকবার তা উল্লেখ করা হচ্ছে। তার আগে এককথায় ঐসকল লোক, শ্রেণী ও জাতিগোষ্ঠীর কথা বলি যাদের ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র বহুল আলোচিত ব্যাখ্যা (ছোট কুফর) গ্রহণযোগ্য ও উপযুক্ত হবে। বরং বর্তমান সময়ের একমাত্র প্রয়োগ ক্ষেত্র বললেও ভুল হবে না।

সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র এই ব্যাখ্যা ঐ সকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য,

১. যারা খিলাফাহ'র অধিনস্ত ভূখণ্ডে কিংবা বিচ্ছিন্ন দারুল ইসলামে বসবাস করে। যেই রাষ্ট্র তাওহীদের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে। কোন জাতি, গোষ্ঠী, বংশ, সীমানা, সম্প্রদায় বা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো পরিচয়ের উপর গড়ে ওঠেনি।

২. যেই ভূখণ্ডের ঘোষিত সংবিধান হবে শরীয়াহ মোতাবেক। এবং তা সক্রিয় থাকতে হবে। কোন কুফরী মতবাদের ভিত্তিতে নয়।

৩. যেখানের দায়িত্বশীল ব্যক্তির রাষ্ট্র ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গ্রহণকারী।

বৈপরীত্যের কারণ:

সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মূল্যবান বক্তব্য প্রয়োগ করার সুযোগ কেন পাচ্ছি না? জোরপূর্বক প্রয়োগ করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেন বাধাগ্রস্ত হতে হচ্ছে? উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্যের পরিধি ও অসামঞ্জস্যতা কতটুকু? ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝার জন্য সামনে কিছু কারণ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

বৈপরীত্যের কারণ:

১. তৎকালীন সময়ে শাসকগণ ইসলামের অনুসারী ছিলেন। বরং সর্বত্র তাওহীদ ও আল্লাহর কর্তৃত্ব বাস্তবায়নের জন্য ঝান্ডা বহনকারী এবং নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তারা।

পক্ষান্তরে বর্তমানের শাসকরা সকলেই ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু। বরং ইসলামকে ধ্বংস করে গণতন্ত্র আর সেকুলারিজমের মত কুফরী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছে।

২. রাষ্ট্রের একমাত্র সংবিধান ছিল কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী সংবিধান।

পক্ষান্তরে বর্তমানে "সাইসপিকো বর্ডারে"র উপর নির্মিত প্রতিটি রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ এর মাধ্যমে বাতিল (অবৈধ) করা হয়েছে। সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে গণতান্ত্রিক ও সেকুলারিজমের নীতিমালার উপর ভিত্তিতে।

৩. সমাজের মূল কাঠামো শরীয়তের ভিত্তির উপর সু-প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং এর প্রভাব সমাজের সর্বত্র পরিপূর্ণ বিদ্যমান ছিল। এবং অপরিহার্যভাবে সেগুলো মানতে বাধ্য ছিল।

রাষ্ট্রীয়ভাবে তো ইসলামকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এটার প্রভাব এতটাই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, আইন ও সংবিধানের কারণে সমাজ ও পরিবারের মধ্যেও "তাওহীদের ভিত্তিতে" পরিপূর্ণ ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট (পূর্ণাঙ্গ) বাঁধা রয়েছে।

৪. খিলাফাহ'র অধীনস্থ বিচারকগণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাখ্যা বা মতামত প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাফের মুরতাদ শাসকদের অধীনস্থ আমলা ও বিচারকদের ক্ষেত্রে তিনি এই মত (ছোট কুফর) ব্যক্ত করেননি। বরং তাদের জন্য তিনি স্পষ্ট রাই ঘোষণা করেছেন আত্মা হলো; আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন বিধান দ্বারা ফায়সালা করা সব বড় কুফর, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিস্কার করে। এব্যাপারে তাঁর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরেকটি বর্ণনা হলো এমন যে- "একজন ব্যক্তির কাফের হওয়ার জন্য এতটুকই যথেষ্ট"।

৫. বিবেকশূণ্য অবৈধ আবেগ তড়িত খারেজী সম্প্রদায়ের অনিষ্টতা রোধ করার জন্য তিনি এই মত (ছোট কুফর) প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমানে যারা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এ ব্যাখ্যাটি (ছোট কুফর) যেই জাতি-গোষ্ঠী, শ্রেণী ও লোকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে, তারা হলো ইসলামের সুস্পষ্ট শত্রু। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলামকে বিলুপ্ত করার কাজে লিপ্ত হয়। তাদের অনিষ্টতা কারণে মুসলিমরা আজ সৈমানহারা হচ্ছে। সুতরাং এই সমস্ত কাফের-মুরতাদদের ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এই মহান ব্যাখ্যা প্রজ্ঞাপূর্ণ পবিত্র মতামত কিভাবে প্রয়োগ করা যায়? এটা বিকৃতি ছাড়া আর কি হতে পারে!

৬. ইসলামের স্বার্থ তথা দ্বীনের সামগ্রীক বিষয়াবলির বাস্তবিক রূপরেখা রক্ষা করার জন্য উক্ত মত প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমানের রাষ্ট্রের এ সকল শ্রেণী ও লোকদের দ্বারা ইসলামের সকল কিছু নিষ্পেষিত হচ্ছে। ইসলাম ধ্বংসের সকল ষড়যন্ত্রের ষোল কলা পূর্ণ হয়েছে তাদের। সুতরাং কিভাবে সেই ব্যাখ্যা এই তাগুত শাসকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়! তৎকালীন যুগের শাসকদের সাথে এদের সামান্যতম মিলও কি আছে?

৭. মুসলিমদের যাবতীয় অধিকার-ঈমান-আমল, জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান, নিরাপত্তা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করে ছোট কুফরের মত প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে এই সমস্ত দরবারী ও শিক্ষিত শয়তানেরা মুসলিমদের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান, নিরাপত্তাসহ সব ধরনের অধিকার হরণ করে চলছে। এমনকি তাদের ঈমানটুকু ধারণ করার সুযোগ দিতে রাজি না। মুসলিমদের ঈমান ধ্বংস করার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে।

৮. তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রের একমাত্র সংবিধান ও স্বাভাবিক নীতি হিসেবে কুরআনের আইন-ই গ্রহণযোগ্য ছিল। পক্ষান্তরে বর্তমানে প্রতিটি অঞ্চলে "ইসলামী আইন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর একমাত্র গ্রহণযোগ্য নীতি ও সংবিধান হলো গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সেকুলারিজমের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত সংবিধান।

৯. বিচারকদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সংকোচবোধ ও অপরাধবোধ জাগ্রত ছিল।

পক্ষান্তরে এদের অন্তরে কোন ধরনের সংকোচ বোধ নেই। বরং তারা এই কুফরী পথ অবলম্বন করে সন্তুষ্ট ও গর্বিত।

১০. নিয়মতান্ত্রিকভাবে, ধারাবাহিকতার সাথে শরীয়ত বিরোধী ফায়সালা করতেন না। এবং এই কার্যক্রমে লিপ্ত থাকতেন না।

পক্ষান্তরে এরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে, ধারাবাহিকতার সাথে শরীয়ত বিরোধী ফায়সালা করে থাকে। এবং এই কার্যক্রমে লিপ্ত থাকার জন্য প্রতিযোগিতা করে একের পর এক অন্যান্য কর্মকাণ্ড করতে থাকে।

১১. তাদের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীনতা বা তচ্ছিল্যতা ছিল না।

পক্ষান্তরে এই লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ জিনিসের জন্য ইসলামকে তচ্ছিল্য ও হেয় করতে দ্বিধাবোধ করে না।

১২. ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী বিচার কার্য ফয়সালা করার প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। ইসলামবিরোধী তথা কুফরী, শিরকী ও নাস্তিকতাপূর্ণ সংবিধান অনুযায়ী বিচার কার্যের শপথ গ্রহণ করে থাকে।

১৩. জরুরীয়াতে দ্বীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত ছিলেন এবং সেগুলোর প্রতি যত্নবানও ছিলেন। পক্ষান্তরে এই শয়তানের অনুসারীদের নিকট আল্লাহর দ্বীনের কোন মূল্যই নেই। যতক্ষণ নিজেদের মনমতো হয় ততক্ষণ খুব দ্বীনদার বনে থাকে। আর যখনই নিজের মনের বিরুদ্ধে চলে চায় তখনই ইসলামকে ছুঁড়ে ফেলতে দ্বিতীয়বার ভাবার প্রয়োজন হয় না।

১৪. তারা দ্বীন তথা ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এবং নিজেদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ইসলাম অনুযায়ী পরিচালিত করেছেন। পক্ষান্তরে এই লোকেরা ইসলামকে নিজেদের পছন্দমত গুটিকয়েক আচার-

আচরণ আর নাম সর্বস্ব কিছু বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। এবং নিজেদেরকে ইসলামের সামনে পরিপূর্ণ সঁপে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে।

১৫. তারা ওই শাসকদের প্রতিনিধি হিসেবে "বিচার বিভাগে"র দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যারা "শরীয়তের ভিত্তিতে" ইসলামী আইনকেই একমাত্র সংবিধান রূপে বহাল রেখেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমানের এই লোকেরা এমন শাসকদের প্রতিনিধি হিসেবে বিচার বিভাগে দায়িত্ব পালন করছে যারা ইসলামের পরিবর্তে "কুফরী গণতন্ত্র" ও "নাস্তিকতাপূর্ণ সেকুলারিজমে"র আদর্শে বিশ্বাসী। এবং প্রকাশ্যে ইসলামকে বাতিল করে দিয়ে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সেকুলারিজমের নীতিমালার আলোকে গঠিত সংবিধান গ্রহণ করেছে।

১৬. তারা কখনোই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়কে ইসলাম থেকে আলাদা ভাবেননি, বরং জীবনের প্রতিটি বিষয়ে ইসলামকে সমানভাবে মূল্যায়ন করেছেন। পক্ষান্তরে এ সকল লোকেরা রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন ও দিকনির্দেশনা কে সেকেলে বর্বরতা ও পশ্চাৎমুখীতা বলে হয়ে প্রতিপন্ন করেছে।

১৭. গ. তারা ইসলামী সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, সম্মান প্রদর্শন ও পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা এবং সাধারণ নীতি অনুযায়ী আল্লাহর নির্ধারণ করা সংবিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করতেন। পক্ষান্তরে এই লোকেরা ইসলামী সংবিধানের প্রতি নিকৃষ্ট বিদ্বেষ, প্রকাশ্যে অবাধ্যতা ও কর্মগত বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে। এবং কুফরী নীতিমালা অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করে থাকে।

১৮. তাদের মধ্য হতে হাতে গোনা দুই একজন লোক ব্যক্তি-পর্যায়ের কোন কারণে (সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় চাপের কারণে নয়) হঠাৎ গোজামিল দিয়ে আল্লাহর নির্ধারণ করা সংবিধানের বিপরীত বিচার ফায়সালা করতেন। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা এমন যে, এখানে এমন কোন জাতি, গোষ্ঠী সম্প্রদায় বা শ্রেণী খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা আল্লাহর নির্ধারণ করা সংবিধান অনুযায়ী ফায়সালা দেয়াকে আবশ্যকবলে গণ্য করেছে। বরং এদের প্রত্যেকেই কুফরী সমাজ ও ইসলাম বিদ্বেষী রাষ্ট্রের একনিষ্ঠ আনুগত্যে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে প্রতিযোগিতা করে থাকে।

১৯. তারা আল্লাহর আইনকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে বিপরীত আইনকে প্রাধান্য দেননি। পক্ষান্তরে এই লোকেরা রা আল্লাহর আইনকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে বিপরীত আইনকে প্রাধান্য দিয়েছে, বরং অত্যাবশ্যক সাব্যস্ত করেছে।

২০. তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর আইনের "বিপরীত আইন" প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

পক্ষান্তরে এরা "স্থায়ীভাবে" ও "সাধারণ নীতি" হিসেবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত ফায়সালা দেয়াকে "পেশা বা কর্ম স্বরূপ" গ্রহণ করেছে।

২১. তারা ঘটনাক্রমে প্রবৃত্তির তাড়না ও নফসের প্ররোচনায় পড়ে হঠাৎ শরীয়তের বিপরীত কোন ফায়সালা দিয়েছিলেন। বিবেকের সিদ্ধান্ত আর যুক্তির দাবিতে সেগুলো করেননি।

পক্ষান্তরে বর্তমানের এই লোকেরা অভ্যাসগতভাবেই নিসংকোচে, বিবেকের সিদ্ধান্ত ও যুক্তির দাবিতে আল্লাহর আইনের বিপরীত ফায়সালা প্রদান করে।

এখানে নয় নাম্বার কারণটা স্পষ্ট করে লিখা হয়েছে।

৯. তৎকালীন সময়ে বিচ্ছিন্ন দু'-চার জন বিচারক ঘটনাক্রমে স্বজনপ্রীতি বা সাধারণ কোন কারণে হঠাৎ শরীয়ত বিরোধী কোন ফায়সালা দিলেও তাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সংকোচবোধ ও অপরাধবোধ জাগ্রত ছিল এবং ভয়-শংকা কাজ করতো।

পক্ষান্তরে বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে সকল বিচারকই প্রকাশ্যে নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে শরীয়ত বিরোধী আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করছে। আর এজন্য তাদের অন্তরে (গ্রহণযোগ্য) কোন ধরনের সংকোচবোধ নেই। বরং তারা এই কুফরী পথ অবলম্বন করে সন্তুষ্ট ও গর্বিত।